এখনো ক্রীতদাস!

● ইমতিয়ার শামীম

এই একবিংশ শতাব্দীতেও সদর্পে টিকে আছে ক্রীতদাস প্রথা। মানুষকে তার শ্রমের জন্য যথাযথ মর্যাদা ও পারিশ্রমিক না দেয়ার মানসিকতা থেকে মানুষ মানুষকে যেসব উপায়ে পণ্য করে তোলে, সেসবের মধ্যে সবচেয়ে ঘৃণ্য পথটি হলো মানুষকে ক্রীতদাসে পরিণত করা

ক্রীতদাস প্রথার বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে আব্রাহাম লিংকন মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন আমেরিকার ইতিহাসের। আলোড়ন তুলেছিলেন সারা পৃথিবীতে। দাসসমাজ পর্ব থেকে শুরু করে বছরের পর বছর ধরে যে অমানবিক ব্যবস্থার শিকার হতে হয়েছে মানুষকে, মরেও যে ব্যবস্থার হাত থেকে মুক্তি পায়নি মানুষ, সে ব্যবস্থার মৃত্যুঘণ্টা বেজে উঠেছিল লিংকনের অনমনীয় অবস্থানে। কিন্তু সত্যিই কি মৃত্যু ঘটেছে ক্রীতদাস প্রথার? যদি তিনি ফিরে আসতেন এই কালে এই পৃথিবীতে, তাহলে নিশ্চয়ই স্বস্তির সব চিহ্ন নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত তার মুখ থেকে।

থাইল্যান্ডের গহিন অরণ্য থেকে কয়েক সপ্তাহ আগে উদ্ধার করা হয়েছে এ সময়ের ক্রীতদাসদের। তাদের মধ্যে বেশিরভাগই বাংলাদেশি। বিদেশে ভালো চাকরির লোভ দেখানো হয় তাদের অনেককে। তারপর মাদকদ্রব্য খাইয়ে অজ্ঞান করে সমুদ্রপথে নিয়ে যাওয়া হয় গহিন অরণ্যে। কাউকে কাউকে আবার লোভ নয়– সরাসরি অপহরণ করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। গহিন অরণ্যে তাদের রাখা হয়েছিল সময়সুযোগমতো সুবিধাজনক স্থানে পাচার করে দিতে।

একবিংশ শতাব্দীতে এসে ক্রীতদাস বানানোর এ ঘটনা অনেকের কাছে গল্পই মনে হবে– কিন্তু গল্প তো নয়, জলজ্যান্ত সত্যি এই ঘটনা। থাইল্যান্ড নতুন এই দাসব্যবসার রুট, প্রভাবশালী ব্যক্তিরা যুক্ত এ ব্যবসার সঙ্গে– দূর অতীতেও যেমন এ ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন প্রভাবশালী অভিজাতরাই। মে মাসে এক সামরিক অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে যখন প্রায়ুথ চ্যান-ওচা প্রধানমন্ত্রিত্বের দায়িত্ব নেন, তখন তার অন্যতম প্রতিশ্রুতিই ছিল মানবপাচারের মাধ্যমে ক্রীতদাস বানানোর এ প্রক্রিয়াকে রোধ করা। কিন্তু তার সে প্রতিশ্রুতি তিনি রাখতে পারেননি। এখনো থাইল্যান্ড মানবপাচারের রুট হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে সগৌরবে। বিবিসির অনুসন্ধানে জানা গেছে, দক্ষিণ থাইল্যান্ডে এমন একটি চক্র রয়েছে, যারা অনেক আগে থেকেই বিভিন্নভাবে কব্জায় নিয়ে গিয়ে ক্রীতদাসের জীবনযাপনে বাধ্য করছে বাংলাদেশিদের। বিভিন্ন খামারে বা মাছ ধরার ব্যবসায় ব্যবহার করা হচ্ছে তাদের। এবার অনেকটা আকস্মিকভাবেই দক্ষিণ থাইল্যান্ডের উপকূল থেকে সেখানকার আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী উদ্ধার করেছে এ রকম ক্রীতদাসদের– যাদের মধ্যে অন্তত ১৩০ জন বাংলাদেশি। তিন সপ্তাহ বন্দি জীবনযাপন করার পর স্থানীয় জেলা প্রশাসন কর্মকর্তার অভিযানে উদ্ধার হয়েছেন এ বন্দিরা। ওষুধ খাইয়ে, হাত-পা বেঁধে বন্দি করে সমুদ্র পথে নিয়ে যাওয়া হয়েছে তাদের। নৌকায় যারা ছিলেন, তাদের তথ্যমতে, সেখানে অন্তত ৩০০ মানুষ ছিলেন। তার অর্থ, অনেককে এর মধ্যেই অন্য কোথাও চালান করে দেয়া হয়েছে।

উদ্ধার হওয়া মানুষগুলোর বন্দি হওয়ার অভিজ্ঞতা একেক জনের একেকরকম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত একখানে এসে অভিন্ন হয়ে গেছে তাদের সে অভিজ্ঞতা– তারা সবাই ক্রীতদাসে পরিণত হয়েছিলেন, অভুক্ত রাখা হতো তাদের সবাইকে, প্রচ- মারধর করা হতো। ১৮ বছরের আবদুর রহিম তার যে অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করেছেন, তা শুনলে শিউরে উঠতে হয়। বগুড়া থেকে আবদুর রহিম ঢাকা গিয়েছিলেন কাজের খোঁজে। এক লোক তাকে বেশি বেতনে কাজ দেয়ার কথা বলে নিয়ে যায় কক্সবাজারে। পাহাড়ের ওপর একটি ছোট ঘরে রাখা হয় তাকে। তারপর বেঁধে ফেলে এমন কিছু খাওয়ানো হয় যে অজ্ঞান হয়ে পড়েন তিনি। জ্ঞান ফিরে এলে নিজেকে আবিষ্কার করেন একটি নৌকাতে। অথৈ সমুদ্রে ভেসে চলেছে সেটা তার মতো আরো অনেক বন্দিকে নিয়ে। এভাবেই ৭-৮ দিন কেটে যায় তার। সম্পূর্ণ অচেনা, অজানা সমুদ্র তীরবর্তী জঙ্গলের মধ্যে নিয়ে যাওয়া হয় তাদের। প্রায়ই তাদের অবস্থান বদল করতে হতো। ধরা না পড়ার জন্যই তারা অবলম্বন করে এই পন্থা। খেতে দেয়া হতো না তাদের। জঙ্গলের লতাপাতা খেয়ে তারা ক্ষুধা মিটিয়েছেন বেশ কয়েকদিন। উপন্যাসের পাতায় অলিভার টুইস্টকে আবারো খাবার চাওয়ায় নিগৃহীত হতে হয়েছিল– বাস্তবে অলিভার টুইস্টের পরিণতিই বরণ করতে হয়েছে আবদুর রহিমকে। ক্ষুধা না মেটায় বাড়তি খাবার চাওয়াতে পিটিয়ে খোঁড়া করে ফেলা হয়েছে তাকে। প্রায় একইরকম অভিজ্ঞতা আরো সবার।

থাইল্যান্ডের জঙ্গলকে আশ্রয় করে অনেক আগে থেকেই চলছে এই দাস ব্যবসা। মিয়ানমারের রোহিঙ্গা শরণার্থী সমস্যা তুঙ্গে ওঠার পর ক্রীতদাস ব্যবসায়ীদের কপাল খুলে যায়। হতভাগ্য মানুষদের কাজ দেয়ার কথা বলে নিয়ে এসে পরিণত করা হতো ক্রীতদাসে। উদ্বাস্তু, রাষ্ট্রীয় পরিচয়হীন রোহিঙ্গারা বাধ্য হয় সে জীবন মেনে নিতে। রাষ্ট্রীয় পরিচয় আছে, এমন নাগরিকদের ভাগ্যও যে সুপ্রসন্ন তা তো নয়। কাজের অধিকার মানুষের মৌলিক অধিকার, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই রাষ্ট্র পারে না মানুষের সে অধিকার পূরণ করতে। একবার এখানে তো আরেকবার ওখানে– মানুষ জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এভাবে দৌড়ে বেড়ায় একখান থেকে আরেকখানে। আমাদের দেশে আমরা মানুষের কর্মসংস্থানের এই নিরুপায় প্রচেষ্টাকে আদর করে বলে থাকি 'জনশক্তি রফতানি'। এভাবে যাদের রফতানি করা হয়, তাদের সবার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয় না। কাজ নিয়ে যেখানে যান, সেখান থেকে অনেকেরই বাইরে বেরোনোর অধিকার থাকে না। কার্যত তারা বন্দি জীবনযাপন করেন, পরিণত হন দাসে। আবার রফতানি হতে না পেরে অনেকে বাঁকা পথে চেষ্টা চালান বিদেশে যেতে, পরিণত হন ক্রীতদাসে। প্রতি বছর অসংখ্য নারী পাচার হয়– তারাও কার্যত পরিণত হন ক্রীতদাসে। আমাদের দেশে অহরহই আমরা খবর শুনি, গৃহপরিচারিকাকে বন্দি করে রেখে কাজ করানো হয়, অবর্ণনীয় নির্যাতন করা হয়– এও তো এক ধরনের ক্রীতদাসত্বই!

এই একবিংশ শতাব্দীতেও এভাবে সদর্পে টিকে আছে ক্রীতদাস প্রথা। মানুষকে তার শ্রমের জন্য যথাযথ মর্যাদা ও পারিশ্রমিক না দেয়ার মানসিকতা থেকে মানুষ মানুষকে যেসব উপায়ে পণ্য করে তোলে, সেসবের মধ্যে সবচেয়ে ঘৃণ্য পথটি হলো মানুষকে ক্রীতদাসে পরিণত করা। আইনগতভাবে তো বটেই, সামাজিকভাবেও এ কাজকে দেখা হয় ঘৃণার চোখে। অথচ তারপরও প্রভাবশালী, ক্ষমতাবানদের চক্র মুনাফার লোভে নানা ঝুঁকি থাকার পরও এ ব্যবসা করে চলেছে। সর্বোচ্চ শাস্তিও খুব হালকা মনে হয় ক্রীতদাস ব্যবসায়ীদের এই অপরাধের। যদিও শাস্তি তাদের কখনই হয় না, তারা রয়ে যায় ধরাছোঁয়ার বাইরে। ■